একজন নূপুরের বেঁচে থাকা এবং একটি পরিবারের গল্প

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

লাইনার সঙ্গে অনেক অমিল সত্ত্বেও নূপুরের রয়েছে অদ্ভুত এক মিল- ট্র্যাজিক মিল। মহাকাশযানের শীতল ঘরে লাইনার কেটেছে ৫০ বছর। আর নূপুর জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি শীতল ঘরে এরই মধ্যে পার করছে প্রায় দুই বছর।

লাইনা বর্তমান পৃথিবীর কোনো চরিত্র নয়। সে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একজন মহাকাশচারী। মুহম্মদ জাফর ইকবালের সায়েন্স ফিকশন 'নিঃসঙ্গ গ্রহচারী'র কেন্দ্রীয় চরিত্র। মহাবিশ্বে নতুন মনুষ্য বসতি খুঁজে বের করার জন্য যে ৩০ জন মহাকাশচারীর সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিল মহাকাশে। অন্য সবার সঙ্গে লাইনাকেও ৫০ বছরের জন্য শীতল ঘরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। অর্ধ শতাব্দী পর জেগে উঠে হঠাৎ করে সে বুঝতে পারে যে পেরিয়ে গেছে দীর্ঘ ৫০ বছর।

নূপুরের ক্ষেত্রেও কি এমন হবে? হঠাৎ করেই কি জেগে উঠবে সে? ভাঙবে কি তার দীর্ঘ ২ বছরের নিদ্রা? নূপুর তো সায়েন্স ফিকশনের কোনো চরিত্র নয়। সে বাস্তব। তার জেগে ওঠা লাইনার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। একটি পরিবার সে অপেক্ষায় আছে একটি বছর। সময়ের কাছে ১ বছর কোনো বড় কিছু নয়, কিন্তু নূপুরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কয়েকটি চরিত্রের কাছে অনেক সময়। কারণ তারা গুনেছে প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মুহূর্ত।

২২ নবেম্বর ২০০৩। অপেক্ষার যাত্রা এখান থেকেই শুরু। ভারতের হরিয়ানা প্রদেশের কার্নাল শহরে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয় শিক্ষা সফরে যাওয়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৩য় বর্ষ (পুরাতন)-এর ছাত্রছাত্রীরা। এদের মধ্যে ৯ জন মারাত্মকভাবে আহত হন। মারা যান একজন শিক্ষকসহ এবং একজন শিক্ষার্থী। আহতদের মধ্যে অন্যরা এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলেও শুধু নাজনীন খান নূপুরের জীবন থমকে আছে ২২ নবেম্বর ২০০৩ সালেই। কোমায় ছিলেন তিনি বহুদিন। ডাক্তাররা ক্লিনিক্যালি ডেথ্-ই ঘোষণা করেছিলেন। তারপরও নূপুর বেঁচে আছেন। অফুরন্ত জীবনীশক্তি নিয়ে নাকে নল ঢুকিয়ে আজও তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। চোখে শূন্য দৃষ্টি। কথা বলা, হাঁটচলা, স্বাভাবিকভাবে খাদ্য গ্রহণ- কোনোটিই তিনি করতে পারেন না। নিশ্চল একটি শরীর দিনের পর দিন লেপ্টে থাকে বিছানায়। তবুও তিনি মরে যাননি, এই মৃতপ্রায় বেঁচে থাকা সন্তানকে নূপুরের মা প্রতি মুহূর্তে দেখছেন, কষ্ট পাচ্ছেন।

নাজনীন খান নূপুর ছিলেন পরিবারের প্রাণ। বাবা আবুল হাশেম খান ও মা বিলকিস খানের বড় মেয়ে। পুরো বাড়িটি একাই মাতিয়ে রাখতেন। 'নূপুর মা' বলতে পাগল ছিলেন বাবা-মা। 'বড় আপি' বলতে অজ্ঞান ছিলেন ছোট ৩ বোন। আজও তারা নূপুরকে 'নূপুর মা', 'বড় আপি' বলে ডাকেন। একবার, দু'বার, বারংবার। কিন্তু নূপুর আর সাড়া দেয় না। নিশ্চুপ শুয়ে থাকে। পুরনো নূপুরের কথা ভেবে, উজ্জ্বল শিঞ্জনধ্বনির মতো নূপুরের কথা

bci‡K wN‡i ¯ä mgq Kv‡U Zvi cwiev‡ii

ভেবে তারা স্তব্ধ হয়ে যান। সেই নূপুরের কথা ভেবে যখন এই নূপুরের মুখের দিকে তাকান, তখন তাদের শুধু কষ্ট বাড়েই, কমে না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দুর্ঘটনার খবর দেশে পৌঁছে পরদিন। 'আমরা তখন জানি না নূপুর বেঁচে আছে না মরে গেছে। কে একজন ভাসাভাসাভাবে জানালো নূপুরের মৃত্যু সংবাদ। কোনটা সত্যি সেটা জানার জন্য পরদিনই নূপুরের ছোট খালুকে ভারত পাঠাই। ওখানে পৌঁছে সে আমাদের ফোনে জানালো নূপুর বেঁচে আছে। তবে ভালো নেই। সপ্তাহখানেকের মধ্যে নূপুরের মা ও সোহেলসহ (নূপুরের স্বামী) আমি ভারত যাই।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে তবেই থামলেন নূপুরের বাবা।

তারা সবাই গিয়ে নূপুরকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে পায়। নূপুরের সহপাঠী দেনেব দেওয়ানও ছিল সেখানে। ডাক্তাররা বলেছিলেন দেনেবের আগেই নূপুর সুস্থ হবে। কিছুদিন পর দেনেব আইসিইউ থেকে বের হয়ে এলে আশান্বিত হয় নূপুরের অভিভাবকরা। দেনেব যখন তার মাকে 'মা' বলে ডাকে, তখন যেন শূন্যতায় নূপুরের মার বুকটা হাহাকার করে ওঠে। কতদিন তার আদরের ধন তাকে 'মা' বলে ডাকে না! তিনি কি তখন ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পেরেছিলেন, আগামী দু'বছরেও নূপুর তাকে 'মা' বলে ডাকবে না! হয়তো বা কখনোই....। ঝাপসা দৃষ্টি আর বুজে আসা গলা নিয়ে নূপুরের মা পাথরের মতো বসে থাকেন সামনে। বুঝতে পারি না নূপুরের মাকে কি বলে সান্ত্বনা দেয়া উচিত হবে। তিনি বসে আছেন চুপচাপ। মনে হচ্ছে নূপুরের মতো। সন্তানের কষ্ট নিজের মধ্যে ধারণ করে বিলকিস খান এখন নিথর প্রাণ। টপ টপ করে গাল বেয়ে অশ্রুর ধারাও আনতে পারে না তার শরীরের প্রাণ।

ডাক্তারের আশ্বাসের ভিত্তিতে নূপুরের অভিভাবকরা ভেবেছিলেন, এই দুঃস্বপ্ন সাময়িক, স্বল্পকালীন। কিন্তু সময় যতো যাচ্ছে দুঃস্বপ্ন ততো দীর্ঘায়িত হচ্ছে। নূপুরের পরিবারের শত শত বিনিদ্র রজনীর কেবল শুরুটা ছিল ২২ নবেম্বর ২০০৩।

সময় যতো পেরিয়েছে, দুঃস্বপ্ন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। গত দু'বছর নূপুরের জীবন কেটেছে হাসপাতালে। সেই সঙ্গে নূপুরের প্রিয়জনদেরও। এ দু'বছর হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে আলাদাভাবে 'হাসপাতাল গন্ধ' বুঝতে পারে না তারা।

২০০৪-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত চন্ডিগড় পিজিআই হাসপাতালে থেকেছে নূপুর। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ট্রান্সফার হয়েছিলেন নূপুর। কিছুদিন বাবা-মার সঙ্গে ধর্মশালায়ও ছিলেন। কিন্তু অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। ড. ফরিদ, ড. কাঞ্চন মুখার্জী, ড. শুভেন্দুরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছেন। লাভ হয়নি। অতঃপর ডাক্তারদের পরামর্শেই তাকে দেশে নিয়ে আসা হয়। দেশে ফিরলেও নিজের বাসায় কম দিনই থাকতে পেরেছে নূপুর। হাসপাতাল-ক্লিনিকেই পার করেছেন বেশির ভাগ সময়। ব্লাডারে পাথর হওয়ায় অপারেশন করিয়েছে। মুখে ঘা হাওয়ায় স্বাভাবিক খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া থেমে গেছে। তখন থেকেই রাইস টিউব দিয়ে তাকে খাওয়াতে হয়। এখনও চলছে এভাবেই।

বাংলাদেশের হাসপাতাল-ক্লিনিক কোনটিই বাদ দেয়নি প্রিয়জনরা। এখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে সবাই! গত কিছুদিন যাবৎ নূপুরের ওষুধ বন্ধ। অর্থনৈতিক ব্যাপারও এর একটি বড় কারণ। এখন শুধু রাইস টিউব দিয়ে যতোটুকু খাদ্য সে গ্রহণ করতে পারে, তার ওপর বেঁচে আছে নূপুর। এ বছর জুন মাসে ভারতে নূপুরের চিকিৎসক ড. ফরিদ বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার মতে, দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারলে নূপুর এতোদিনে সুস্থ হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু দেশের বাইরে নূপুরের চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য পরিবারটির নেই। 'আমি যদি জানতাম নূপুর আর কোনোদিন ভালো হবে না, মেনে নিতাম। কিন্তু ডাক্তার যে বললো দেশের বাইরে নিয়ে গেলে ও সুস্থ হয়ে যাবে! এখন এটা আমরা কিভাবে মানি? টাকার অভাবে কি আমার মেয়ে এভাবে মরে বেঁচে থাকবে?' নূপুরের মার এ আকুতির কাছে আমরা অসহায়। দিতে পারিনি এ প্রশ্নের উত্তর। এ দেশের বিবেকবান মানুষ যদি পারেন, জবাব দেবেন।

নূপুরের বাবা আবুল হাশেম খান পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রোডাকশন ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত। পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস তিনি। ক'টাকাই বা আর বেতন পান? তবুও মেয়ের চিকিৎসার জন্য দু'বছরে তিনি খরচ করেছেন প্রায় ১০ লাখ টাকা। ঢেলে দিয়েছেন সামর্থ্যের শেষ রক্তবিন্দু। এখন আর তিনি পারছেন না। সে জন্য বন্ধ রয়েছে নূপুরের চিকিৎসা। নূপুর তো তার একমাত্র মেয়ে নয়, আরো ৩টি মেয়ে আছে। মেজো মেয়ে কাঁকন গত বছর এইচএসসি পাস করেছে। সেজো মেয়ে নীলা এ বছর ভর্তি হয়েছে কলেজে। আর ছোট মেয়ে নিশা পড়ছে তৃতীয় শ্রেণীতে। এই মেয়েগুলোর পড়াশোনা করানো, তাদের ভালো বিয়ে দেবার দায়িত্বও তো রয়েছে বাবা-মার। সে দায়িত্বের কথা তারা আপাতত ভুলে গিয়েছিলেন। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন নূপুরের জন্য। 'তবুও তো আমার মা নূপুর কথা বলে না, হাঁটে না, খায় না। আমাকে চিনতে পারে বলেও মনে হয় না।' চোখ মুছতে মুছতে কথাগুলো বললেন, নূপুরের হতভাগ্য বাবা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নূপুর-সোহেল ছিল যেন মানিকজোড়। সবসময় একসঙ্গে থাকতো তারা। পড়ালেখার সময়, আড্ডার সময়ও। বন্ধুদের মাঝে থেকেও তারা দু'জন যেন আলাদা হয়ে যেতো। দু'জনই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী। সোহেল নূপুরের ১ বছরের সিনিয়র। নূপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে তার ভবিষ্যৎ জীবন আবর্তিত হবে সোহেলকে ঘিরেই। সোহেলের অনুভূতিও ভিন্ন নয়। ভবিষ্যৎ সুখ কল্পনায় এ দু'জন দিনের একটা বড় অংশ ব্যয় করতো। সময়ের পরিক্রমায় দু'পরিবারের সম্মতিতে ১৮ আগস্ট, ২০০৩ নূপুরের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয় সোহেল। এর দু'মাস পর ১৩ নবেম্বর শিক্ষা সফরে ভারত যায় নূপুর। সোহেল সেখানে যেতে পারেনি। কারণ সামনেই তার ছিল মাস্টার্স পরীক্ষা। এরপর তো ২২ আগস্টের সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

সোহেল-নূপুর এখনো একসঙ্গে থাকে। তাদের সংসার করার সাধ পূরণ হয়নি। হয়নি 'সুখ কল্পনা'গুলো বাস্তবায়িত। একটি মাত্র

eÜ‡`i m‡½ D"Qj bci (Dc‡i)| evevi m‡½ wbðj bci (wb‡P)| bc‡ii D"QjZv wdwi‡q Avbvi Rb¨ we‡`‡k wPwKrmv c‡qvRb| †mRb¨ `iKvi ü`qevb‡`i mnvqZv| mvnvh¨ Ki‡Z cv‡ib wb‡Pi wnmve b¤‡i:
mÂqx wnmve bs Ñ 34341076
†mvbvjx e¨vsK
†mbwbevm K‡cv‡iU kvLv, XvKv

‘আমি যদি জানতাম নূপুর আর কোনোদিন ভালো হবে না, মেনে নিতাম। কিন্তু ডাক্তার যে বললো দেশের বাইরে নিয়ে গেলে ও সুস্থ হয়ে যাবে! এখন এটা আমরা কিভাবে মানি? টাকার অভাবে কি আমার মেয়ে এভাবে মরে বেঁচে থাকবে?’

দুঃস্বপ্নেই এলোমেলো হয়ে গেছে দুটি জীবন।

সোহেল এখন নূপুরদের বাড়িতেই থাকেন। ছোটখাটো একটা চাকরি করেন। এ বছর মাস্টার্স পরীক্ষা দিচ্ছেন। নূপুরের অসুস্থতার কারণে গত বছর পরীক্ষা দিতে পারেননি। তার অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আহতদের জন্য একটা টাকাও দেয়নি। প্রাথমিকভাবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যানকে ভারতে যাবার সময় ১ লাখ টাকা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আহতদের চিকিৎসার জন্য যে ৫ লাখ টাকা দেয়া হয়, সেখান থেকে ঐ ১ লাখ টাকা কেটে রাখে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া ভারতে থাকাকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন সুহৃদ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ২ লাখ টাকা তুলে পাঠায় আহতদের চিকিৎসার জন্য। এরাই দৈনিক প্রথম আলোর ব্যানারে একটি কনসার্ট আয়োজন করে। যেটা থেকে নূপুরের পরিবার পায় মাত্র ৬৮ হাজার টাকা। ক্ষতিগ্রস্তরা এতো কম টাকা কেন পেল, সেটা নিয়েও রয়েছে বিস্তর অভিযোগ।

কিন্তু এ পর্যন্তই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি টাকাও আহতদের চিকিৎসার্থে ব্যয় করেনি। যা করার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী-শিক্ষকরাই করেছেন। এ ছাড়া নূপুরের দীর্ঘ চিকিৎসার সময় তার মামা, খালা ও অন্য আত্মীয়স্বজনরা যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। ‘সবাই সাহায্য করেছে। একমাত্র আল্লাহই করেননি। করলে কি আর আজও আমার মেয়ে এ অবস্থায় থাকে?’ নূপুরের মায়ের এ আক্ষেপ বাতাসেই মিলিয়ে যায়।

সব সময় হৈ চৈ পছন্দ করতো নূপুর। দুঃখকে আড়াল করে জীবন কাটাতো আনন্দে। জাবি’র জাহানারা ইমাম হল ছিল সপ্তাহে ৫ দিনের ঠিকানা। বৃহস্পতিবার বাসায় এসে আবার শনিবার চলে যেতো। ‘তখন যেন জাহাঙ্গীরনগরই ছিল ওর সব। ওর বান্ধবীরাও রাতে এসে আমাদের বাসায় থাকতো। এখন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বড় আপি বিছানায় পড়ে আছে। কেউ ওকে দেখতেও আসে না। শুরুর দিকে কয়েকজন খোঁজখবর নিতো। এখন একজনও আসে না। বড় আপি বেঁচে আছে না মরে গেছে তার খোঁজও কেউ নেয় না। যে জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসকে সে এতো দিয়েছিল, ক্যাম্পাস তাকে কতটুকু ফিরিয়ে দিতে পেরেছে?’ মেজ বোন কাঁকনের রাগ সবার ওপর। কেউ তার বড় আপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। একই সঙ্গে সে এটাও বোঝে তার বড় আপির জীবন ২২ নবেম্বর ২০০৩-এ থমকে থাকলেও তার বন্ধুদের জীবন তো অনেক এগিয়ে গেছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে নূপুরও হয়তো হতো তাদের সঙ্গী অথবা অগ্রগামী একজন।

নূপুর ভালো দাবা খেলতেন। ছিলেন হল চ্যাম্পিয়ন। নাটক করতেন। পছন্দ করতেন টিভি দেখতে, গান শুনতে। এখন টিভির সামনে নিয়ে গেলে, গান ছাড়লে নূপুরের কোনো ভাবান্তর হয় না। সাজগোজেও দারুণ আগ্রহ ছিল নূপুরের। এখন কিন্তু সাজগোজে তার তীব্র অনীহা। বোনরা তাকে সাজাতে গেলে সে তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বোনদের খামচি দেয়, মারে, শক্ত করে ধরে রাখে। ‘ও যখন রেগে যায়, তখনই কেবল ওর দেহে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়। ওর হাতে-পায়ে যে জোর নেই, কথাটা ঠিক না। যদি তাই হতো তাহলে এতো শক্ত করে আমাদের ধরতে পারতো না। ডাক্তারের ধারণা নূপুর কিছুটা হাঁটাচলা হয়তো করতে পারে। কিন্তু সে তো তা করে না। কে জানে, আমরা হয়তো তার ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারছি না বলে সে রাগ করেছে।’ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নূপুরের মা কথাগুলো বললেন।

তবে কখনো কখনো রাগ ভাঙে নূপুরের। যেমন ভেঙেছিল সেদিন। ২০০৩ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করে নূপুরের মেজ বোন কাঁকন। বাসায় মিষ্টি আনা হয়েছে। বড় আপির সামনে গিয়ে কাঁকন বললো, ‘বড় আপি, আমি পাস করেছি। তুই মিষ্টি খাবি না?’ হঠাৎ করেই যেন নূপুরের ঠোঁটের কোন হাসি দেখা যায়। মুখ হা করে সে। মিষ্টি খায়। বোনের সঙ্গে খুনসুটি করে। যে যা করতে বলে, তাই করে। নূপুরের পরিবারে বয়ে যায় খুশির বন্যা। সবাই ভাবে নূপুর ভালো হয়ে গেছে। নূপুরের মা নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে শোকর করেন। রাতে ঐ বাসায় পোলাও-গোশ্ত রান্না করা হয়। অনেক রাত পর্যন্ত সবাই জেগে থাকে। গল্পগুজব করে। আড্ডা দেয়। আনন্দে ঝলমলে মুখগুলো এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে বাবা অফিসে যাবার সময় তাকে টাটা দেয় নূপুর। মাকে চুমু খায়। কিন্তু বেলা ১১টার দিকে আবার সব ভুলে যায় সে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে জন্মদাত্রী মায়ের দিকে। তাকে যেন চিনতেও পারে না নূপুর।

আবার দু’মাস পর একই ঘটনা। সেটাও কিছু সময়ের জন্য। আবার ছ’মাস পর ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ডাক্তারদের ধারণা, নূপুর হয়তো তার সব মানসিক ও শারীরিক শক্তি জমিয়ে রাখে ঐ একটি মাত্র দিনের জন্য। ঐ একদিন সেই পরিবারে আনন্দের বান ছোটে। আবারও স্তব্ধ হয়ে যায় নূপুর। চেষ্টা করেও সে পারে না স্বাভাবিক হতে। শরীর তাকে সেই সাপোর্ট দেয় না। শারীরিক এই সামর্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন উন্নত চিকিৎসা। বিদেশে নিতে হবে নূপুরকে। কিন্তু তাকে বিদেশ নেবার সামর্থ্য তো তার পরিবারের নেই। তবে দেশের আছে। দেশের এমন অনেক মানুষ আছেন, যাদের কাছে নূপুরের চিকিৎসা খরচ বহন করা কোনো ঘটনাই নয়। তারা যদি এগিয়ে না আসেন, তাহলে এভাবেই তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবে সম্ভাবনাময় একটি জীবন। একটি পরিবার।

অভিমান করেছে নূপুর। তীব্র অভিমান। দেশের প্রতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি। হয়তো বন্ধুদের প্রতিও। সবাই নূপুরকে ভুলে গেছে। নূপুরের জীবন এখন চার রুমের ফ্ল্যাটে সীমাবদ্ধ। বাবা-মা-বোন-স্বামী ভোলেনি। তবুও ওদেরকেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে নূপুর।

৬ মাস, ১ বছর পর পর নূপুরের অভিমান ভাঙে। তখন সে বোনদের সঙ্গে খুনসুটি করে। মাকে চুমু দেয়, অফিসে যাবার সময় বাবাকে টাটা দেয়। সোহেলকে দেখলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে আনন্দে অভিভূত হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই! ১২ ঘন্টা, বড় জোর ২৪ ঘন্টার জন্য। এরপর আর শরীরে কুলায় না। মানসিক শক্তিও নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার অভিমান করে নূপুর। ঘুমিয়ে পড়ে শীতল ক্যাপসুলে। স্থায়ীভাবে নূপুরের অভিমান ভাঙানোর জন্য, শীতল ক্যাপসুল থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য কেউ কি নেই? এ দেশের বিবেকবান মানুষ, সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবাই কি ঘুমুবে কুম্ভকর্ণের ঘুম? আর নূপুর ঘুমিয়ে থাকবে শীতল ক্যাপসুলে অনন্তকাল?

‘লাইনা’ চরিত্রের স্রষ্টা মুহাম্মদ জাফর ইকবাল তাকে দীর্ঘ ৫০ বছর শীতল ঘরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে জাগিয়ে তুলেছেন। লাইনার জন্য তার মা-বাবা-বোন ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করেনি। প্রিয়তম স্বামী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেনি। নূপুরের জন্য করছে। তাদের প্রতীক্ষার প্রহর আর দীর্ঘায়িত না করার জন্য তারা সবাই তাকিয়ে আছে সেই সময়ের দিকে। যখন নূপুর ফিরে আসবে তার জীবনে। শেষ হবে প্রতীক্ষার পালা। পুরো পরিবার যা পারেনি আমাদের মধ্যে একজন, দু’জন অথবা কয়েকজনের সামান্য চেষ্টায় ফিরে পেতে নূপুর তার স্বাভাবিক জীবন। সে চেষ্টাটাই আমাদের করতে হবে। সৃষ্টিকর্তার সেরা সৃষ্টি মানুষ হিসেবে।